Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 415 – 427
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

গোয়েন্দা চারুচন্দ্র ভাদুড়ির জীবন ও পরিচয়

মহ. সইফুল ইসলাম
গবেষক, শান্তিনিকেতন
ইমেইল : Saifulkhan.ju@gmail.com

Keyword
গোয়েন্দা সাহিত্য, গোয়েন্দা গল্প, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভাদুড়িমশাই, ব্যোমকেশ, ফেলুদা, খুন, রহস্য।

Abstract
ভাদুড়িমশাই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে তেমন একটা পরিচিত চরিত্র নয়। তাকে নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়েছে। তাই পাঠকদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। পুরো সিরিজে প্রত্যেকটা কাহিনি ধরে আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং বাস্তবের কোন ব্যক্তিকে ভেবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভাদুড়িমশাই চরিত্রটির সৃষ্টি করেছিলেন তার অনুসন্ধান চালিয়েছি আমরা। এছাড়া তাঁর গোয়েন্দাগিরির প্রকৃতি কেমন ছিল, তিনি কীভাবে নানা রহস্যের সমাধান করতেন, অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন ও অন্যান্য গোয়েন্দার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion
বাংলা তথা বিশ্ব গোয়েন্দা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রবীণ বা বয়স্ক গোয়েন্দা হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সৃষ্ট চারুচন্দ্র ভাদুড়ি বা ভাদুড়িমশাই। ভাদুড়িমশাইকে কেন্দ্র করে মোট ১৭ টি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আমরা মূলত কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই চিনি বা জানি। পঞ্চাশের দশকে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে গুটিকয়েক গোয়েন্দা গল্প লিখে থেমে যান। গোয়েন্দা গল্প হিসেবে সেগুলো ততটা আকর্ষণীয় বা উন্নতমানের নয়। পরে আশির দশকের একেবারে শেষদিকে রবিবাসরীয় বর্তমান পত্রিকায় গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে থাকেন। পুরো নব্বইয়ের দশক জুড়ে লিখে যান।

ভাদুড়িমশাই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে তেমন একটা পরিচিত চরিত্র নয়। তাকে নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়েছে। তাই পাঠকদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। পুরো সিরিজে প্রত্যেকটা কাহিনি ধরে আমরা তার পূর্ণাঙ্গ জীবনের বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ইনসিওরেন্স কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থেকে বেসরকারি গোয়েন্দা :

পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়, যাঁদের ভাগ্যান্বেষণের জন্য বাইরে বেরোনোর ফলে জীবনের প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। রচিত হয়েছে নতুন কাহিনি। তা হয়ত লৌকিক, কখনও অলৌকিক গালগল্প

সমৃদ্ধ কখনও বা সাহিত্য সম্পৃক্ত ঘটনাবলী। নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় সেই উদাহরণ অপ্রতুল হবে না, তাই দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখাকে আর ভারাক্রান্ত না করাই শ্রেয়। তবে সাহিত্যক্ষেত্রের একটা উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথা অনেকেরই জানা। সেখানে নজর রাখলে দেখতে পাই ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক কথক সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশাল জমিদারীর ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে বিহারের পূর্ণিয়ায় জঙ্গলমহলে যান এবং তারই বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতার ফসল 'আরণ্যক'।

১৯৪৬ সাল। সদ্য গ্র্যাজুয়েট কিরণ চ্যাটার্জি তখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়, "বিষাণগড় প্যালেসের জন্যে একজন কেয়ারটেকার চাই।"[১] এই মর্মে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে কথক কিরণ চ্যাটার্জির। আবেদন করেন। সাড়া মেলে। চাকরিতে জয়েন করেন। ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত যুবকের এবার ভাগ্যের চাকা বদলে যাবার কথা। হ্যাঁ ভাগ্য অবশ্যই বদলেছিল। তা কিন্তু সুখের ছিল না। রাজবাড়ির কেয়ারটেকারের চাকরি তাঁর ভাগ্য রথের চাকাকে আরও পাঁকে ফেলে দেয়। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এমনকি খুনও হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক বাঙালি যুবক চারুচন্দ্র ভাদুড়ি। যিনি বিলিতি বিমা-কোম্পানি কাম্বারল্যান্ড ইনসিওরেন্সের বিষাণগড়ের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে বছর খানেক আগে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ভাদুড়িমশাই নামে পরিচিত হন। তাঁর গোয়েন্দাগিরিতে আমরা ব্যোমকেশ ফেলুদার মতো একের পর এক গোয়েন্দা কাহিনি লাভ করতে থাকি। ভাদুড়িমশাই সিরিজ ব্যোমকেশ ফেলুদার মতো ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি, কিন্তু সাহিত্যমূল্য হিসেবে এর গুরুত্ব খুব একটা কম নয়, ভবিষ্যৎ সে বিষয়ে কথা বলবে।

যাইহোক, কথা হল কথক কিরণ চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যান্বেষণে সুদূর বিষাণগড়ে যাবার ফল স্বরূপ ভাদুড়িমশাইয়ের আবিষ্কার। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল ভাদুড়িমশাইকে নিয়ে। প্রথমে কাহিনির ভাদুড়িমশাইয়ের সাথে আলাপচারিতা সেরে পরে আসল ভাদুড়িমশাইয়ের খোঁজ করব আমরা। আসল বা বাস্তবের ভাদুড়িমশাইয়ের কথা উল্লেখ করার কারণ হল, লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (যাঁকে বাঙালি পাঠক কবি বলে জানেন) ২০০৬ সালে দে'জ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ভাদুড়িমশাই সিরিজের প্রথম খণ্ডে 'লেখকের কথা' অংশে জানিয়েছেন, "উপন্যাসগুলি পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত হলেও ভাদুড়িমশাইকে কন্তু কাল্পনিক চরিত্র বলা যাচ্ছে না। চরিত্রটিকে তৈরি করেছি আমারই এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আদলে।" একেবারে শেষদিকে আমরা বাস্তবের ভাদুড়িমশাইকে নিয়ে আলোচনা করব।

ভারতবর্ষ তখনও ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি। স্বাধীনতা লাভ করতে আরও বছর দেড়েক বাকি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালের বিকালবেলা। সুদূর মধ্যপ্রদেশের বিষাণগড়ের রাজপ্রাসাদ চত্বরে ড. সিদ্দিকির বাংলোয় মুখোমুখি দুই বাঙালি যুবক। এক যুবক মাত্র কিছুদিন হল রাজ প্যালেসের কেয়ারটেকার হিসেবে চাকরিতে জয়েন করেছেন। অন্যজন বিমা-কোম্পানি কাম্বারল্যান্ড ইনসিওরেন্সের বিষাণগড়ের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বছর খানেক আগে। কেয়ারটেকার যুবক কিরণ চট্টোপাধ্যায় কাহিনির কথক। আর ম্যানেজার যুবক কাহিনির নায়ক। যাকে ঘিরে প্রত্যেকটা কাহিনি আবর্তিত। কিরণ চ্যাটার্জি রাজপ্রাসাদের আর্কিটেকচার বিষয়ে জানতে ড. সিদ্দিকির কাছে যান। সেখানেই চারুচন্দ্র ভাদুড়ির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি চাকরিতে জয়েন করেন। জয়েন করেই বেশ কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যেগুলো বেশ ভয়ঙ্কর। তারমধ্যে মারাত্মক হল রাজ এস্টেটের এরিয়ায় দু-দুটো খুন হয়ে যায়। তাই ভাদুড়িমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেন,

> "... আপনি এখানে নতুন এসেছেন তো, তাই গায়ে পড়ে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। একটু সাবধানে থাকুন। আর যা-ই করুন, বেশি রাত করে ... মানে পথে যখন লোকজন খুব কম, তখন ... রাস্তাঘাটে পারতপক্ষে বেরুবেন না।"[২]

কিরণবাবু যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। কিন্তু রাজ পরিবারের অন্দরের একের পর এক নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। ২৮ জুন ১৯৪৬ এ ফের খুন হয় অজ্ঞাত পরিচয় তিন জন আদিবাসী। রাজ পরিবারের এক পক্ষের (রাজা ধূর্জটিনারায়ণ

সিং এর দুটো বিয়ে। তাই রাজ সিংহাসনের কর্তৃত্ব নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব।) ইশারা মতো পুলিশ তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়। কিরণবাবু সাদামাটাভাবে তদন্তের রিপোর্টে যে ফাঁকফোকর তা নিয়ে সবার মাঝে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেন। যার ফলে তিনি রাজ রোষের শিকার হন। ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায় তাঁর বিরুদ্ধে। ২ জুলাই ফের একটা খুন হয়ে যায়। এবার খুন করা হয় কিরণ চ্যাটার্জিকে ফাঁসানোর জন্য। একইদিনে রাজবাড়ির কিচেন থেকে কিরণবাবুর জন্য যে খাবার আসে তাতে বিষ মেশানো ছিল। অজ্ঞাত কোন শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি ফোন মারফত সেকথা কিরণবাবুকে জানিয়ে দেন।

কয়েকটা দিন খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাটে। এরই মধ্যে ৮ জুলাই কিরণবাবুর নামে পুলিস গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। কিরণবাবুর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতে চলেছে জানতে পেরে আগেভাগেই ভাদুড়িমশাই কিরণবাবুকে ফোন করে ড. সিদ্দিকির বাংলোয় শীগগির চলে আসতে বলেন। সেদিনের রাতের ঘটনা এবং তারপর রাজপরিবার ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভাদুড়িমশাই অবশ্যই ড. সিদ্দিকির সহযোগিতায় কিরণবাবুকে যেভাবে বের করে নিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেন সেই লোমহর্ষক কাহিনি জানতে হলে উপন্যাস পড়তে হবে।

'বিষাণগড়ের সোনা' উপন্যাসটি সময়কালের দিক থেকে দুটো ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ১৯৪৬ সালের ঘটনা। যে ভাগে রাজা মৃত হলেও রানী আছে, রাজকুমার আছে, রাজপুরোহিত আছে। সবকিছু মিলিয়ে একটা রাজ পরিবার ও রাজত্ব আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই সময় পর্বে যুবক কিরণ চট্টোপাধ্যায় রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের কাজে নিযুক্ত হন। তার বছরখানেক আগে একটা বীমা কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে আসেন এখানে। কাহিনি পাঠ করে জানা যায় ভাদুড়িমশাই এই পর্বে গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ চরিত্র নন। তবুও তাঁর কার্যাবলী একজন সম্পূর্ণ গোয়েন্দার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। রাজবাড়ির হেঁসেল থেকে কিরণবাবুর জন্য যে ভাত আসে তাতে বিষ মেশানো ছিল, সে কথা কিরণবাবুকে যিনি জানিয়েছেন তিনি কে এবং কীভাবে তিনি জানতে পারলেন খাবারে বিষ মেশানো ছিল, আবার অন্যদিকে কিরণবাবুর নামে পুলিশের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতে চলেছে সেখবরও থানা থেকে কীভাবে ফাঁস হল এগুলোর কথা ভাদুড়িমশাই নিজেই জানিয়েছেন। তিনি কিরণবাবুকে জানান,

> "কাম্বারল্যান্ড ইনসিওরেন্স এখানে মোটা টাকার কাজ-কারবার করে। তা সেই কাজে যাতে কেউ বাগড়া দিতে না পারে, তার জন্যে সর্ব ঘাঁটিতে কিছু-না কিছু লোককে তাদের হাতে রাখতে হয়। তেমন লোক প্যালেসে আছে, থানায় আছে, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টেও আছে।"[৩]

আর এই সুযোগটাকেই তিনি কাজে লাগান কিরণবাবুকে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য।

তিনি যেভাবে রাজবাড়ির ষড়যন্ত্রকে ফাঁস করে কিরণবাবুকে বাঁচান, কালপ্রিট খুনি ত্রিবিক্রম কাপুরকে (বিষাণগড়ের দেওয়ান) যে কায়দায় ডেকে শায়েস্তা করেন, তাতে বিষাণগড়ে মাথায় পাথর ফেলে থেঁতলে পরপর খুন হয়ে যাওয়াকে বন্ধ করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আনেন তা যে কোনও বড়োসড়ো গোয়েন্দাদেরও হার মানায়। সরাসরি না হলেও কথক সেরকমই একটা ইঙ্গিত কাহিনির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে দিয়েছেন আশির দশকের শেষদিকে (কাহিনির দ্বিতীয় ভাগ শুরু হচ্ছে তেতাল্লিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে।) কলকাতায় স্টোনম্যান হত্যাকান্ডের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে। সেই সময় কলকাতার ফুটপাতে রাস্তায় ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে মাথায় পাথর ফেলে একের পর এক হত্যা করা হচ্ছিল, তাতে পুলিশের কালঘাম ছুটে যায়। যে কলকাতা পুলিশকে বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশদের সাথে তুলনা করা হয়, সেই কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা হত্যাকারীর কোনও হদিস পায়নি। এমনকি এই হত্যাকে কোনোভাবে রুখতে পারেনি। কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতার পাশাপাশি ভাদুড়িমশাইয়ের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে গোয়েন্দা না হয়েও ভাদুড়িমশাইয়ের গুরুত্ব কতক্ষানি তারই ইঙ্গিত আছে। আমরা প্রায় গোয়েন্দা কাহিনিতে দেখি পুলিশকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় কাহিনির নায়ক বা ডিটেকটিভের গুরুত্ব ও কার্যকারিতাকে বড় করে দেখানোর জন্য। এমনকি বিশ্বসেরা গোয়েন্দা কাহিনির ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের গুরুত্ব বাড়াতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সরকারি পুলিশ গোয়েন্দাদের হামেশাই ছোটো করে দেখানো হয়েছে। সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হল ভাদুড়িমশাই এখানে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছেন না। কাজ করছেন বীমা কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে। তবুও তাঁর কার্যাবলী গোয়েন্দাদের মতোই। একইভাবে গোয়েন্দা নয় অথচ বীমা কোম্পানির এজেন্ট হয়ে কীভাবে রহস্যজনক এক ঘটনার হদিস বের করেছিলেন তার চমৎকার উদাহরণ লর্ড ডানসেনির লেখা সেই বিখ্যাত কাহিনি 'Two Bottles of Relish' এ আছে। এক ক্লায়েন্ট তার স্ত্রীর নামে মোটা টাকার ইনসিওরেন্স করে। কিছুদিন পর তার স্ত্রী রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত করে স্ত্রী লোকটির খোঁজ না পাওয়ায় নিখোঁজ ঘোষণা করে। লোকটি কোম্পানির কাছে স্ত্রীর নামে ইনসিওরেন্সের টাকা দাবি করে। ব্যক্তিটির দাবি যথাযথ কি না জানার জন্য কোম্পানি এজেন্ট পাঠায়। তদন্ত করে জানা যায় লোকটি মোটা টাকার লোভে তার স্ত্রীকে খুন করে রান্না করে খেয়ে নিয়েছে।

গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে খড়ি ঠিক এভাবেই। এমনকি গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে প্রবেশও এভাবেই। যদিও তিনি কলেজে পড়ার সময় ল্যাবোরেটরির চোরকে পাকড়াও করেন। তাতে তাঁর গোয়েন্দাগিরির একটা আভাস পাওয়া যায় 'আংটি রহস্য' উপন্যাসে।

কিরণবাবুর চলে আসার কয়েকমাস পরে ভাদুড়িমশাইও বিষাণগড় থেকে পাকাপকিভাবে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় অর্থাৎ

> "এখানে তিনি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির হয়ে কাজ করতেন। গোটা দুই-তিন রহস্যের কিনারা করে তখন তাঁর খুব নামও হয়েছিল। তবে কলকাতাতেও তিনি বেশিদিন থাকেননি। বড় একটা চাকরির অফার পেয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যান।"[৪]

কলকাতায় এলেই তিনি কিরণবাবুর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন, হরবছর বিজয়ার চিঠি লিখতেন। এই হল ভাদুড়িমশাই আর কিরণবাবু জুটির পথ চলা শুরু।

দীর্ঘকাল আর কোনও উল্লেখ নেই। এরপর আমরা ভাদুড়িমশাইয়ের প্রথম গোয়েন্দাগিরি দেখতে পাই ১৯৭৩ সালের ঘটনা নিয়ে ১৯৮৮ সালে লেখা 'মুকুন্দপুরের মনসা' উপন্যাসে, উত্তরবঙ্গে এক বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি হয়ে যাওয়া সাড়ে ন'শো বছরের একটা পুরনো মূর্তি উদ্ধারেরে মাধ্যমে। এই উপন্যাসেই দেখতে পাই ভাদুড়িমশাই ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রথমে কলকাতায় এসেছিলেন বীরভূমের মন্দির থেকে চুরি হয়ে যাওয়া সাড়ে তিনশো বছরের এক অষ্টধাতুর বিগ্রহের তদন্তের জন্য।

আমরা দেখতে পাই গোয়েন্দা হিসেবে ভাদুড়িমশাই বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন ইতিমধ্যে। নিজেই একটা বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করেছেন। যার নাম চারুচন্দ্র ভাদুড়ি ইনভেস্টগেশানস্। সংক্ষেপে সি. বি. আই.। যার প্রধান কার্যালয় ব্যাঙ্গালোরে এবং সারা ভারতবর্ষে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রইছে। বিদেশে অফিস না থাকলেও এজেন্ট মারফত বিদেশের খবর পেতে অসুবিধা হয় না। এই চারুচন্দ্র ভাদুড়ি ইনভেস্টগেশানস্ বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রথম প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা। আর ভাদুড়িমশাই হলেন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে প্রথম পেশাদারি বেসরকারি গোয়েন্দা। এর আগে আমরা দেখতে পাই ইউরোপীয় সাহিত্যে পেশাদারি গোয়েন্দা পার্কার পাইনকে। বয়সে ইনি ভাদুড়িমশাইয়ের মতো প্রৌঢ় এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবী, পেশায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। স্রষ্টা অগাথা ক্রিস্টি পার্কার পাইনকে নিয়ে খুব বেশি কাহিনি লেখেননি। ভাদুড়িমশাইয়ের সাথে যে দু'জন গোয়েন্দা চরিত্রের কিছুটা মিল পাওয়া যায় তারমধ্যে পার্কার পাইন একজন। অন্যজন অগাথা ক্রিস্টিরই আরেক গোয়েন্দা চরিত্র এরিকুল পোয়ারো। তবে এরিকুল পোয়ারোর সাথে তুলনাকে স্রষ্টা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন তাঁরই নাতনী কমলিনী চক্রবর্তীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

> "দেশি বিদেশি গোয়েন্দা সাহিত্য তো প্রচুর পড়েছি তাই কখনও কারও প্রভাব ভাদুড়িমশাইয়ের চরিত্রে পড়তেই পারে। তবে সচেতনভাবে আমি ভাদুড়িমশাইকে অন্যান্য গোয়েন্দাদের স্বতন্ত্র রাখারই চেষ্টা করেছি।"[৫]

ভাদুড়িমশাইয়ের ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধান :

২২১ বি বেকার স্ট্রিটের বাসা বাড়ি। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুটো শোবার ঘর। আলো বাতাস ভাল খেলে এরকম বড়োসড়ো বসবার একটা ঘর। আসবাবপত্র দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো বসবার ঘরটিতে বড় বড় দুটো জানলা। নাম্বার দেখেই গোয়েন্দা কাহিনি পাঠক মাত্রেই বুঝে নেবেন যে এটা বিশ্বের সেরা ও জনপ্রিয় গোয়েন্দা শার্লক হোমসের ঠিকানা। সাথে ওয়াটসন।

ভাদুড়িমশাইয়ের বাড়ির নাম্বার নেই। ব্যোমকেশ বক্সীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তাঁর বাড়ি হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী বা এম. জি. রোড)-এর একটা বাড়ির তেতলায়। ভাদুড়িমশাইয়ের বাড়ি ছিল ভবানীপুরে এটুকুই জানা যায়। তিনি বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। সেখানেই তাঁর অফিস। কিন্তু অফিসের ঠিকানাটুকুরও উল্লেখ নেই। যেমন দেখি ডিটেকটিভ পার্কার পাইনের অফিসের ঠিকানা ১৭, রিচমন্ড স্ট্রিট। ব্যাঙ্গালোরের অফিসের ঠিকানার উল্লেখ না থাকলেও কলকাতা ও দিল্লির অফিসের ঠিকানার উল্লেখ আছে। তবে বাড়ির নাম্বারের উল্লেখ নেই। কলকাতার অফিস হল ক্যামাক স্টিট আর প্যাটেল-নগরে একটা ফ্ল্যাটের তিনতলায় হল দিল্লি ব্রাঞ্চের অফিস। এটুকুই। ভাদুড়িমশাই ব্যাঙ্গালোরে থাকেন, তাঁর ব্রাঞ্চের হেড অফিস ব্যাঙ্গালোর অথচ সেখানকার কোনও ঘটনা, জীবনচর্যার উল্লেখ নেই। এমনকি তদন্তের কাজে এই অফিসের কোনও ভূমিকা দেখি না। শুধু নামের উল্লেখটুকুই পাই।

বিপত্নীক ভাদুড়িমশাই ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। একমাত্র কন্যা বিদেশ থাকে বিবাহসূত্রে। কোনও ভাই নেই। তিন বোন। বাবা মায়ের কোনও উল্লেখ নেই। মেয়ে আর দুই বোনের কোনও উপস্থিতি নেই পুরো সিরিজ জুড়ে। কলকাতায় এলে থাকেন ছোট বোন মালতী সান্যালের যতীন বাগচি রোডের বাড়িতে। ফ্ল্যাট নাম্বার চোদ্দর সাতের দুয়ের বি। পরে মালতী ঠিকানা বদলায়। কাঁকুড়গাছির মোড়ের কাছে সি. আই. টি. রোডের ধারে একটা সাততলায় একটা ফ্ল্যাট কেনে। পরে সেখানেই উঠতেন। কলকাতায় এলেই অবধারিতভাবে তিনি ডেকে নেন তাঁর বন্ধু ও সুহৃদ, কথক সাংবাদিক কিরণ চট্টোপাধ্যায়কে। আর কিরণ চ্যাটার্জির সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর প্রতিবেশি ও ভাদুড়িমশাইয়ের বিশেষ অনুরক্ত সদানন্দ বসুকে। ভাদুড়িমশাইয়ের প্রতি সদানন্দবাবুর ভক্তির কারণ আছে। 'শ্যামনিবাস রহস্য' উপন্যাসে দেখি ১৯৮৯ সালে সদানন্দবাবু নিজের বাড়িতে ভাড়াটিয়া খুনের মামলায় ফেঁসে যান। পুলিস খুনের মোটিভ দেখে সদানন্দবাবুকে তুলে নিয়ে যান। কিন্তু কিরণবাবুর অনুরোধে ভাদুড়িমশাই ঘটনাটিকে নিয়ে তদন্ত করেন। শেষে ভাদুড়িমশাইয়ের তৎপরতায় কালপ্রিটরা ধরা পড়ে এবং সদানন্দবাবু এই মামলা থেকে রেহাই পান। সেই থেকে তিনি ভাদুড়িমশাইয়ের নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়েন। এহেন সদানন্দবাবু ভাদুড়িমশাইয়ের নাম শুনলে আসবেন না হতে পারে না।

ফলত মালতীর বাড়িতে জমে উঠে আড্ডা। এই ত্রিমূর্তি ছাড়া থাকেন মালতীর স্বামী অরুণ সান্যাল। যিনি কার্ডিওলজিস্ট ও হার্ট স্পেশালিস্ট। আর মাঝেমধ্যে থাকে মালতির ছেলে কৌশিক। যে তদন্তের কাজে ভাদুড়িমশাইয়ের সহকারি। ফাঁকতালে মালতির চায়ের সাপ্লাই ও ফোড়ন আড্ডায় বাড়তি আকর্ষণ। এই থ্রি মাস্কেটিয়ার্স যেখানেই যান সেখানেই চা সহযোগে আড্ডা জমিয়ে দেন। প্রত্যেকটা কাহিনিতে চায়ের যা বর্ণনা আছে তাতে প্রত্যেক চাতাল (চা পিপাসু) পাঠকের মন চা খাবার জন্য আকুপাকু করবে নির্ঘাত, একথা বলার অবকাশ রাখে না। যার ফলে এখানে কাহিনির চরিত্রের সাথে পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে যায়।

যাইহোক ভাদুড়িমশাইয়ের পরিবার বলতে এরাই। 'বিষাণগড়ের সোনা'য় ১৯৪৬ সালে ভাদুড়িমশাইয়ের বয়স ছিলো পঁচিশ মতো। একদম তরতাজা যুবক। প্রেম বিবাহ নিয়ে কোনও আসক্তি ছিল কি না জানা যায় না। কথক সেরকম কোনও ইঙ্গিত দেননি। তার পরের বছর তো তিনি বিষাণগড় ছেড়ে চলে আসেন। সেখান থেকে কলকাতা, পরে ব্যাঙ্গালোরে পাকাপাকিভাবে চলে যান। এরপর 'মুকুন্দপুরের মনসা'তে ১৯৭৩ সালে দেখি ভাদুড়িমশাই বিপত্নীক। একমাত্র মেয়ে স্বামীর সাথে বিদেশে থাকে। প্রায় পঁচিশ বছরের জীবনের কোনও উল্লেখ পাই না। এরপর ভাদুড়িমশাই আর বিয়েও করেননি। বোঝাই যায় গোয়েন্দাগিরি করে তিনি বেশ আনন্দেই আছেন। বিয়ে তো দূরের কথা পরকীয়াতেও জড়াননি। দেখা যায় ভাদুড়িমশাইকে দ্বিতীয় বিয়ে করা নিয়ে কেউ জোরাজুরিও করেনি। তবে 'শান্তিলতার অশান্তি' উপন্যাসে শান্তিলতা নামের এক জাঁদরেল মহিলা ক্লায়েন্টকে নিয়ে একটু টিপ্পনি কেটেছিল বোন মালতী। সেটা অবশ্য

ভাদুড়িমশাই হেলায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল ২০০১ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ। তখন ভাদুড়িমশাইয়ের বয়স আশির কোঠায়। ফলত বিয়ের প্রশ্ন আসেই না। শান্তিলতার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। তার স্বামীর বয়স পঁয়ষট্টি। ঘটনা যেরকম ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল বয়সের কারণে হয়তো স্বামীর সাথে বনিবনা হচ্ছিল না। তাই সেপারেট থাকতে চাইছে। এবং তাকে কেউ খুন করতে পারে এই আশঙ্কায় ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে এসেছে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দিতে। ভাদুড়িমশাই মহিলা তার উপর স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়া যুবতী ক্লায়েন্টের প্রোটেকশন নিয়ে চিন্তিত দেখে সেই সুযোগে মশকরা করার জন্য মালতী হালকা চালে এরকম টিপ্পনি কেটেছিল বোঝাই যায়। ভাদুড়িমশাইয়ের জীবনে নারী নিয়ে এর বেশি আর কিছু দেখা যায় না।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির জোর থাকলে বয়স কোনও বাধা হতে পারে না। সে প্রেম-বিবাহ হোক, পাহাড় ডিঙানো বা অন্যকিছু। তারপর তিনি যদি আবার সাহিত্যের গোয়েন্দা হন তাহলে তো তার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। তিনি হিরে থেকে জিরে সবই খান, কোনকিছুতেই তাঁর অরুচি নেই। তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই পারেন। বাড়ির ঘড়া থেকে আকাশের তারা সবেরই খোঁজ তার কাছে। শুধু তাই নয়, কোনও ব্যক্তি কী নিয়ে ভাবছে তাও তিনি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারেন। অবশ্য গল্প উপন্যাসের কথকরা গোয়েন্দাদের এই অবিশ্বাস্য শক্তিকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল বলে চালিয়ে সামাল দেন প্রত্যেক কাহিনির ক্ষেত্রে। সে ভলতেয়ারের কাঁদিদ হোক বা আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস হোক। শার্লক হোমস তো ইংরেজ সৈনিকের গায়ের রং দেখে বলে দিতে পারেন কোন দেশ থেকে যুদ্ধ করে এসেছে। জুতোর ডগা দেখে ব্যক্তিটির পেশা বলে দিতে পারতেন।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ফেলুদা এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে। আমাদের আলোচ্য ভাদুড়িমশাইয়ের অনুমান শক্তি ততটা প্রখর নয়। লেখক অন্তত সেরকম করে দেখাননি। আর পাঁচটা গোয়েন্দা কাহিনি লেখক তাঁদের সৃষ্ট গোয়েন্দাদেরকে যেরকমভাবে সৃষ্টি করেন। সে জায়গা থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিছুটা সরে এসে বাস্তবের গোয়েন্দাদের মতো করেই কিছুটা দেখিয়েছেন। যতই একটু আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করুক তবুও স্বাজাত্যবোধ, স্বধর্মের প্রতি টান, সমগোত্রের প্রতি অনুরাগের অন্তঃশলীলাপ্রবাহ একটা থেকেই যায়। ঠিক সেরকমই লেখক এখানে গোয়েন্দা কাহিনির যে অলিখিত নিয়ম 'অবিশ্বাস্যতা' সেই ছোঁয়া এড়াতে পারেননি। আর পারেননি বলেই বুড়ো (সমালোচকরা অবশ্য ভাদুড়িমশাইকে প্রৌঢ় বলে থাকেন। অশিতীপর অর্থাৎ আশি বছরের উপর বয়স্ককে প্রৌঢ় বলেন কোন যুক্তিতে জানা নেই।) ভাদুড়িমশাইকে দিয়ে দুঃসাহসিক সব অভিযান করিয়েছেন। যেমন তেমন অভিযান নয়। বড়ো বড়ো স্মাগলারদের ডেরায় গিয়ে রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে গোলাগুলি করে তাদেরকে কলার ধরে আনা করিয়েছেন লেখক (জাল-ভেজাল উপন্যাস)। এছাড়াও দুষ্কৃতিদের ডেরায় গিয়ে অভিযান চালানো করিয়েছেন (শান্তিলতার অশান্তি, কামিনীর কণ্ঠহার উপন্যাস)। তিনটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বয়স তখন ৭৯, ৮০ ও ৮১ বছর। শার্লক হোমসকে আর্থার কোনান ডয়েল যেরকম মেরে ফেলেছিলেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরও কি তেমনিভাবে ভাদুড়িমশাইকে এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতি অভিযানে পাঠিয়ে মেরে ফেলার ইচ্ছা বাসনা ছিল কি না তেমন কথা জানা যায় না। এমনকি জানারও আর উপায় নেই।

প্রশ্ন হল এই বয়সে এরকম একটা কঠিন অভিযান চালানো সম্ভব? যে বয়সে শরীর ততটা সতেজ থাকে না। নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত নড়বড় করে। চোখের জ্যোতি কমে আসে। সেই বয়সে এরকম কাজ অবিশ্বাস্যকর, সম্ভব নয়। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির আরেক বয়স্ক ডিটেকটিভ কর্নেল (ডিটেকটিভ কথাটি তাঁর পছন্দের নয়) তো ওই বয়সে চারিদিকে চষে বেড়ান। তাহলে ভাদুড়িমশাইয়ের ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন আসছে কেন। ভাদুড়িমশাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। কারণ কর্নেলের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের কোঠায়। ভাদুড়িমশাইয়ের ক্ষেত্রে যে তিনটি কাহিনির অভিযানের কথা বলা হচ্ছে তাতে তাঁর বয়স আশির এপার ওপার। তাঁর চষে বেড়ানোর পক্ষে সাফাই দেওয়া যায়। কিন্তু এরকম অভিযানের জন্য তাঁর হয়ে সাফাই দেওয়া যায় না। যেত যদি তাঁর কাছাকাছি বয়সী এরকুল পেয়ারোর মতো বাড়িতে বসে রহস্যের সমাধান করে দিতেন সেক্ষেত্রে ভাদুড়িমশাইয়ের পক্ষে সাফাই দেওয়া যেত।

এই অবিশ্বাস্যতা বাস্তবের সাথে মিল না খেলেও কাহিনির সাথে সাযুজ্য। বাকি সব বৈশিষ্ট্যগুলি যতটা সম্ভব বাস্তবতা বজায় রেখে বেশ পরিপাটি করে লেখক তৈরি করেছেন। সেসব দিকে নজর রাখলে দেখতে পাব ভাদুড়িমশাই গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে সাহিত্যের গোয়েন্দার মতো আহামরি হাবভাব করছেন না। বরং বাস্তবের পুলিশের গোয়েন্দারা যেভাবে তদন্ত চালিয়ে যায় সেভাবেই তিনি করে গেছেন। পুলিশের গোয়েন্দারা তদন্তের ক্ষেত্রে সোর্সকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। ভাদুড়িমশাই একইভাবে সোর্সকে অধিকাংশ তদন্তের ক্ষেত্রে কাজে লাগান, কখনও তাঁর শিক্ষানবিস ভাগ্নে কৌশিকে দিয়ে কখনওবা তাঁর গোয়েন্দা সংস্থা সি. বি. আই. এর অধনস্ত কর্মী মারফত। সোর্স মারফত বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে সবশেষে চায়ের আড্ডায় বসে সিগারেট টানতে টানতে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করে অপরাধের কিনারা করেন। অহেতুক সাহিত্যসুলভ আতিশয্য নেই। আড্ডায় উপস্থিত থাকেন কিরণবাবু, সদানন্দবাবু মাঝেমধ্যে পুলিশের কর্মকর্তা ও ভাগ্নে কৌশিক।

আড্ডার কথা যখন এসেই গেল তখন গোয়েন্দাগিরিকে পাশ কাটিয়ে একটু চায়ের গল্পে আসা যাক। চা'কে লেখক কিন্তু একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। কথক কিরণ চ্যাটার্জি আর সদানন্দবাবুর চা ছাড়া জীবনটা যেন অষ্ট আনা ফাঁকি। সদানন্দবাবু সারাদিনে তিন কাপ চা খান দুধ চিনি ছাড়া।

> "ঘুম থেকে উঠে এক কাপ, সকালে জলখাবারের সময় এক কাপ আর বিকেলে এক কাপ। ব্যস ওই হচ্ছে লিমিট। তাও দুধ নয়, চিনি নয়, স্রেফ হালকা লিকার।"[৬]

কিরণবাবুও দুধ চিনি ছাড়া হালকা লিকার খান। অবশ্য আগে খেতেন না। সদানন্দবাবুর মরিয়া পরামর্শে খেতে শিখেছেন। আগে দিনে পনের বিশ কাপ চা খেতেন, সেটাও কমিয়ে এনেছেন। কিরণবাবু একটু বেশি চা প্রিয়, তাই আড্ডা হলেই চায়ের গল্প থাকবেই। আড্ডা আর চা একে অপরের পরিপূরক। সে কোথাও ভ্রমণে হোক বা বাড়িতে এমনকি রাস্তার ধারে মোড়ে গাড়ি থামিয়ে হোক। চা অন্তত খাওয়া চায়। তবে ভাদুড়িমশাইয়ের এসবে বাছবিচারের বালাই নেই। কোনওকিছুতে তাঁর অরুচি নেই। আমিষ নিরামিষ যা পান তাই খান। এমনকি ব্যাঙের ঠ্যাঙ খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। ফ্রান্সে থাকার সময় তিনি প্রচুর ব্যাঙ খেয়েছিলেন জানিয়েছেন। এও জানিয়েছেন ব্যাঙের ঠ্যাঙ খেতে মুরগির ঠ্যাঙের মতোই। বরং আরও নরম (বিগ্রহের চোখে)। এহেন সর্বভুক ভাদুড়িমশাইয়ের চায়ে দুধ চিনি মেশানো নিয়ে আপত্তি থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। তিনি যাই খান নিশ্চয় হজম হয়ে যায়। নইলে এত বয়সে একদম ফিট থাকেন কীভাবে। অবশ্য ফিটনেস বজায় রাখার জন্য রোজ ভোরবেলায় ঘন্টাখানেক জগিং করেন। কোনওদিন বাদ যায় না। ব্যক্তিগত জীবনে ভাদুড়িমশাই বেশ টিপটপ। জগিং করে বাড়ি ফিরে সেভিং করেই স্নান সেরে নেন। 'রাত তখন তিনটে' উপন্যাসে ৭১ বছর বয়সেও পাঁচ মাইল দৌড়াতে দেখি।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার হাইট ৬'২", ছতি ৪২ ইঞ্চি। মোটামুটি সুদর্শন চেহারা। ভাদুড়িমশাই লম্বা ও রোগা। তবে কত উচ্চতার পরিষ্কার করে বলা নেই। মেদহীন ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, চাউনি তীক্ষ্ণ। পোশাক বলতে পাঞ্জাবির উল্লেখ আছে। রাতে অপারেশনের জন্য কালো এক সেট পায়জামা পাঞ্জাবি ও একটা কালো মাঙ্কি ক্যাপ থাকে। যা স্পাইডারম্যানের বাঙালি সংস্করণ লাগে।

বাস্তবের গোয়েন্দা হোক বা সাহিত্যের গোয়েন্দা (আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ বাদে। অর্থাৎ যেসব গোয়েন্দা ঘটনাস্থলে না গিয়ে ছোটাছুটি না করে বাড়িতে বসে বসেই সব রহস্যের সমাধান করে দেন।) উভয়কেই ছুটোছুটির জন্য শারীরিক কসরত করতে হয়, ফিটনেস বজায় রাখতে হয়। বাড়িতে চেয়ারে বসে সিগারেট, চুরটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বা চা খেতে খেতে অনেকক্ষেত্রে রহস্যের সমাধান করে দেওয়া যায়। তাই বলে বাড়িতে বসে তো আর খুনী অপরাধী পাকড়াও করা যায় না। ভাদুড়িমশাইকে দুরকমেরই কাজ করতে হয়।

অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে মগজাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও ভাদুড়িমশাই আরেকটা অস্ত্র কাজে লাগান খেলনাস্ত্র। শুনতে হাস্যকর লাগলেও তিনি মাঝেমধ্যে খেলনা পিস্তলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কাজ হাসিল করেছেন (মুকুন্দপুরের মনসা)। আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ থাকলেও পুরো এপিসোডে তিনি মাত্র একবার রিভলভার ব্যবহার করেছেন। 'বিষাণগড়ের সোনা'য় কালপ্রিটকে ফাঁদে ফেলার জন্য ছক করেন। সেই মতো ড. সিদ্দিকিকে চাঁদনি রাতে সর্সোতিয়া নদীর ধারে

দাঁড় করিয়ে রেখে আড়াল থেকে ভাদুড়িমশাই অপেক্ষা করতে থাকেন। ঠিক সময়ে কালপ্রিট হাজির হয়ে পিছন থেকে ছুরি মারতে যেই উদ্যত হয়েছে ঠিক সেই সময় ভাদুড়িমশাই অব্যর্থ লক্ষ্যে ফায়ার করে ছুরিটি উড়িয়ে দেন। কালপ্রিট হকচকিয়ে যায় সেই অবস্থায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে ফের অজ্ঞান করে দেন।

ভাদুড়িমশাই খুন খারাপি পছন্দ করেন না। কালপ্রিটক ধরে কখনও পুলিশের হাতে দিয়ে দেন। কখনও বা শোধরানোর সুযোগ দিয়ে তাকে ছেড়ে দেন। গোয়েন্দা হলেও তিনি মানবিক। এমনকি কথকও সেকথা স্বীকার করেছেন,

> "ভাদুড়িমশাইকে যে এত ভাল লাগে, সেটা আসলে এইজন্যেই। ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন বটে, কিন্তু মানবিক বৃত্তিগুলিকে তাই বলে শুকিয়ে যেতে দেননি।"[৭]

অনেকক্ষেত্রে তিনি ক্লায়েন্টের বাড়তি সমস্যার সমাধান করে দিয়ে আসেন। যে সমস্যাগুলো চুক্তির বাইরে থাকে (মুকুন্দপুরের মনসা, রাত তখন তিনটে, পাহাড়ি বিছে, কামিনীর কণ্ঠহার)। অবশ্য যেচে ভালো করতে গিয়ে ফিরে আসতে হয় 'লকারের চাবি'তে। ক্লায়েন্টের চুরি হয়ে যাওয়া বা অন্য কোনও সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ভাদুড়িমশাই ক্লায়েন্টের বাড়ির পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যে সমস্যার সমাধান ক্লায়েন্টের কল্পনার অতীত ছিল (বিষাণগড়ের সোনা, রাত তখন তিনটে, একটি হত্যার অন্তরালে, পাহাড়ি বিছে, আংটি রহস্য)। বিষয়টি খোলসা করার জন্য একটা উদাহরণ তুলে ধরা যাক। 'বিষাণগড়ের সোনা' উপন্যাসে ক্লায়েন্ট বছর পঁয়তাল্লিশের সত্যপ্রকাশ চৌধুরি তাঁদের বাড়ির কুলদেবতা চুরি হয়ে যাওয়া মনসার মূর্তি উদ্ধারের জন্য ভাদুড়িমশাইকে তদন্তের জন্য ডাকেন। চুরি হয়ে যাওয়া মূর্তি তো উদ্ধার করেন। এর বাইরে পাশাপাশি দুটো বাড়তি সমস্যার সমাধান করে দেন। যে সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা সত্যপ্রকাশ চৌধুরি ভাবতেই পারেননি। সাময়িক একটা সমস্যা ছিল তিনি শিলিগুড়িতে বড়োসড়ো একটা হোটেল খোলার জন্য লোনের আবেদন করেছিলেন। সেই লোন নানা কারণে আটকে যাচ্ছিল। কোনোভাবেই পাস হচ্ছিল না। সত্যপ্রকাশের অজান্তেই ভাদুড়িমশাই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে কথা বলে কোনোরকম ঘুষ ছাড়াই সেই লোন পাইয়ে দেন। লোন পাবার কথা শুনে সত্যপ্রকাশের চোখ ছানাবড়া। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অবশ্য ভাদুড়িমশাইয়ের পরিচিত ছিলেন। আরেকটা সমাধান হল, নিরু। সত্যপ্রকাশের বাড়ি পৌঁছে তার বাড়ির সবার পরিচয় নেন। নিরুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সত্যপ্রকাশ বলেন,

> "নিরু আমাদের কেউ নয়। পাশের গাঁইয়ের মেয়ে। ওর বয়স যখন কুড়ি-বাইশ, তখন টাইফয়েডে ওর স্বামী মারা যায়। তা প্রায় সে বছর-দশেক আগের কথা। একটা দেওর ছিল, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর দিন-দশেকের মধ্যেই নিরু বুঝতে পেরে যায় যে, দেওরের মতলব খুব ভাল নয়। আমার মা-কে সেই কথা বলে এখানে আশ্রয় চেয়েছিল। বাস, সেই থেকে নিরু এ-বাড়িতে আছে।"[৮]

বাবা মা ছেলেপুলে দুকূলে কেউ নেই তার। পরে খোঁজ নিয়ে ভাদুড়িমশাই জানতে পারেন পাশের গ্রামের মেয়ে নিরু আসলে আর কেউ নয়, সত্যপ্রকাশের শালী। সত্যপ্রকাশের বাড়ির কেউ জানে না। কারণ তাঁদের সামাজিকতা অনুযায়ী বিয়ের পর মেয়ের বাপের বাড়ি আমৃত্যু যাওয়া চলে না। যাইহোক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সত্যপ্রকাশের শ্বশুর, শ্বাশুড়ি ও স্ত্রী মারা যায়। (উপন্যাসে নিরুর যে উপকাহিনি সেটা খুব দুঃখজনক ও ট্র্যাজিক।) এই পরিস্থিতিতে নিরুর জীব হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। ঘটনাক্রমে সত্যপ্রকাশ নিরুর কথা জানতে পারেন। জেনে তিনি বাড়িতে মিথ্যা বলে নিয়ে আসেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সত্যপ্রকাশ বিয়ে করেননি কারণ নিরুর প্রতি একটা সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা থেকে। ভাদুড়িমশাই সেটা বুঝতে পারেন। অনুভব করতে পারেন একের প্রতি অপরের প্রয়োজনীয়তা। তদন্ত শেষে বাড়ির সবার সামনে সত্যপ্রকাশ ও নিরুর সত্য ঘটনা প্রকাশ করে তাদের চার হাত এক করে উত্তরবঙ্গের মুকুন্দপুর থেকে কলকাতা ফেরেন। এই ঘটনা মানবিকতার এক অন্যতম নিদর্শন।

ভাদুড়িমশাই যতটা নরম ঠিক ততটাই আবার গরম। অপরাধীকে পাকড়াও করে তার কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে শাস্তির কথা মুখে আনেন এবং এতটা ঠাণ্ডামাথায় নিরুত্তেজভাবে বলেন, তা শুনে যে কারও গা শিউরে উঠবে। বিষাণগড়ের দেওয়ান কালপ্রিট ত্রিবিক্রম কাপূরকে তিনি বলেন,

> "আপনাকে মেরে ফেলব। কিন্তু এমনভাবে মারব, যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে, এটা মার্ডার। কীভাবে সেটা করব, তাও জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই আপনার ঘাড়ের একটা জায়গায় আমি ছোট্ট একটা আঘাত করব। তাতে আপনার শরীরে কোনও দাগ পড়বে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনি জ্ঞান হারাবেন। সেই অবস্থায় একটা গাড়িতে তুলে এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা জঙ্গুলে জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আপনার হাতের একটা শিরা আমরা কেটে দেব, সো দ্যাট ইউ ব্লিড টু ডেথ হোয়াইল ইউ আর স্টিল আনকনশাস। এইবার দেখুন, আপনার শরীরের পাশে আমরা কী রেখে দেব ... এইটে আপনার শরীরের পাশে পড়ে থাকবে। আপনারই ছোরা। আপনারই আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে এতে। আর তাই পুলিশ ধরে নেবে যে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা।"[৯]

তাই বলে এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না ভাদুড়িমশাই দুষ্টের দমনকর্তা, শিষ্টের পালনকর্তা।

ভাদুড়িমশাই অবশ্যই মানবিক। তাইবলে শখের গোয়েন্দাদের মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ান না। তিনি গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছেন। গোয়েন্দাগিরি করে প্রচুর নাম কামিয়েছেন। সেই নামের দরুন অনেক জায়গা থেকে রহস্যের সমাধানের জন্য, চুরি হয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা নিখোঁজ মানুষের উদ্ধারের জন্য ডাক আসে। এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক নেন। সেই পারিশ্রমিক তিনি কাজ সফল হবার পরে নেন। মাঝ রাস্তায় কাজ ছেড়ে দেওয়া বা কাজের শুরুতে টাকা নেন না। কাজ শেষ না করে তিনি এক পয়সাও নেন না সেটা জানিয়েছেন তাঁর ক্লায়েন্ট ফুলকুমারী ঘোষকে (একটি হত্যার অন্তরালে)। তবে সবসময় যে পয়সা নিয়ে কাজ করেন তেমনটাও নয়। বন্ধু ও কথক কিরণ চ্যাটার্জির ডাকে তাঁর প্রতিবেশি ভাড়াটিয়া খুনের অপরাধে অভিযুক্ত সদানন্দবাবুকে বাঁচিয়েছেন নিশ্চিত যাবজ্জীবন জেল হয়ে যাওয়া থেকে (শ্যামনিবাস রহস্য)। আবার 'লকারের চাবি'তে দেখি ভাদুড়িমশাই কলকাতায় এসেছেন, কাঁকুড়গাছির মোড়ের কাছে সি. আই. টি. রোডের ধারে সাততলায় বোন মালতীর নতুন ফ্ল্যাটে আড্ডা জমেছে। আছেন কিরণবাবু, সদানন্দবাবু, মালতীর স্বামী অরুণ সান্যাল, ছেলে কৌশিক। হঠাৎ নিচে রাস্তায় একটা বিকট আওয়াজ শোনা যায়। কৌশিক যায়। ফিরে এসে ভাদুড়িমশাইকে যা জানায় তাতে তাঁর সন্দেহ জাগে। তিনি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে আসেন। সন্দেহ প্রগাঢ় হয়। তিনি নিজেই তদন্তে নেমে পড়েন শখের গোয়েন্দাদের মতো। তবে পুরো এপিসোড জুড়ে কোথাও সরাসরি মজুরি হিসেবে টাকা নেওয়ার উল্লেখ নেই। এমনকি টাকার পরিমাণেরও উল্লেখ নেই।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সীমন্ত-হীরা' উপন্যাসে গোয়েন্দা ব্যোমকেশ কুড়ি হাজার টাকা অফার পেয়েছেন। আজকের দিনের নিরিখে সেই টাকা কম নয়। অবশ্য গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় ইওরোপের গোয়েন্দাদের যে আয় তার তুলনায় এদেশীয় গোয়েন্দাদের আয় অনেকাংশে কম। কিন্তু যে টাকা ব্যোমকেশ পান তাতে তাঁর কুলোয় না বোধহয়। নইলে তাঁর স্ত্রী সত্যবতীর জন্য একটা গাড়ি কিনে দিতে পারবেন না কেন। ভাদুড়িমশাইয়ের আয় কেমন জানা যায় না। তাঁর নিজস্ব গাড়ির কোনও উল্লেখ নেই। তিনি সাধারণত ট্যাক্সি ভাড়া করেই যান। নইলে ক্লায়েন্টদের পাঠিয়ে দেওয়া গাড়িতে। তিনি থাকেন তো ব্যাঙ্গালোরে, সেখানে নিজস্ব গাড়ি আছে কী না তা জানা যায় না। তবে তিনি গাড়ি চালাতে বেশ পোক্ত।

সাহিত্যের প্রায় গোয়েন্দার একেকটা শখ বা নেশা আছে। বই পড়া শখের কথা আর চুরুট, সিগারেটের নেশা তো কমন। ফেলুদা তো বুদ্ধির গোঁড়ায় ধোঁয়া দেওয়াকে তো আর্ট করে তুলেছেন। এটা বাদ দিয়ে কারো বাগান করার শখ (কর্নেল), কারও উল বোনা (মিস মার্পেল)। আবার কাকাবাবুকে দেখি চা খেলে তাঁর ব্রেন সেলগুলো বেশ চাগাড় দিয়ে ওঠে। আর রহস্যের কিনারাও করে ফেলেন। ভাদুড়িমশাইকে দেখি চায়ের খুব একটা নেশা নেই। নেই বলাটা আবার কিছুটা ভুল হতে পারে। তবে নেশা না থাকলেও আসক্তি আছে বলা যেতে পারে। কারণ দেখি ভাদুড়িমশাই, কিরণবাবু, সদানন্দবাবু জুটির দুই চা পিয়াসী একসাথে থাকলেই চায়ের কথা আসবেই। আর চা এলে তিনজনের আসবে। এঁদের দুজনের চায়ে আগ্রহ থাকলেও ভাদুড়িমশাইয়ের আগ্রহ আছে কী না বোঝা যায় না। তবে চা এলে তিনি কখনোই না করেন না। রহস্যের কথা শুনলেই তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠে। রহস্যের জট ছাড়াতে তিনিও অন্যান্য

গোয়েন্দাদের মত বুদ্ধির গোঁড়ায় ধোঁয়া দেন। বাস্তবের ভাদুড়িমশাই ধুমপান করতেন কি না জানা যায় না। তবে লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একসময় দিনে ষাটটা করে সিগারেট খেতেন[১০] । তাই হয়ত গোয়েন্দা ভাদুড়িমশাইকে মনের সুখে যত পেরেছেন সিগারেট খাইয়ে ছেড়েছেন।

প্রয়োজনের খাতিরে দুএকটা কাহিনিতে শখের গোয়েন্দাদের মতো তদন্তে নেমে পড়লেও ভাদুড়িমশাই তো বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রথম পেশাদারি গোয়েন্দা। ক্লায়েন্টরা টাকা দেয় তিনি কাজ করেন। দয়াপরবশ হয়ে অপরাধের কিনারা ছাড়াও অনেক সময় ক্লায়েন্টের জীবন বদলে দেবার মত অন্যান্য বড় সমস্যার সমাধান করে দেন। সেটা না হয় ভাদুড়িমশাইয়ের মানবিক গুণ। কিন্তু তাঁকে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করতে হলে বেশ কিছু শর্ত মানতে হয়। তা ভাদুড়িমশাইয়ের জবানীতে শুনে নেওয়া যাক।

> "আমাকে দিয়ে কাজ করানোর কিছু শর্ত থাকে। প্রথম শর্ত, আমি যে-ভাবে ভাল বুঝব, সেইভাবে কাজ করব। তা নিয়ে আমাকে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। কেন এটা করলুম, কেন ওটা করলুম, ইচ্ছে হলে ক্লায়েন্টকে তা আমি বলব, ইচ্ছে না-হলে আমি বলব না। কিন্তু ক্লায়েন্ট যেন ধরে না নেন, টাকা দিচ্ছেন বলেই তিনি আমার মাথা কিনে নিয়েছেন আর প্রতিটি কাজের জন্য তাঁর কাছে আমি জবাবদিহি করতে বাধ্য। না, আমি বাধ্য নই।"[১১]

তিনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে তদন্তের আগে এক টাকাও চান না। নিজের খরচায় তদন্ত সেরে টাকা নেন। এছাড়া

> "ক্লায়েন্টের উচিত সমস্ত কথা খুলে বলা। তার মধ্যে কোন্‌টা আমার কাজে লাগবে আর কোন্‌টা লাগবে না, সে তো আমি বুঝব।"[১২]

তবে সব কেস ভাদুড়িমশাই নেন না। তাঁর কথায়,

> "যে-সব কেস খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়, সেগুলো নিজে নিই, আর বাদবাকিগুলো আমাদেরই এজেন্সির অন্য লোকেরা হ্যান্ডল করে। তবে তাদেরও তো ক্যাপাসিটির একটা সীমা আছে, তাই কিছু-কিছু কেস ফিরিয়ে দিতে হয়।"[১৩]

কে এই ভাদুড়িমশাই, বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব আছে, কাহিনির চরিত্র বাস্তবে জীবন্ত কেউ হতে পারে? এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় এর অর্ধেক হ্যাঁ, অর্ধেক না। আসলে চরিত্রেরা তো আমাদের আসপাশেই ঘোরাফেরা করে তারই ছায়া লেখকের শরীরে প্রবেশ করে তারপর তাঁর কল্পনার সাথে কোলাকুলি করে কায়া হয়ে লেখায় নামে। আবার লেখক অনেক সময় নিজেকে কাহিনির চরিত্রের রূপ দান করেন। ভাদুড়িমশাই সিরিজে লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কথক হয়ে বর্ণনা করেছেন। আর ভাদুড়িমশাইয়ের রূপ দিয়েছেন তাঁর এক বন্ধুর আদলে। সে কথায় আসার আগে গোটা দুয়েক তথ্য তুলে ধরা যাক। কীভাবে বাইরের উপাদান লেখনীর বস্তু, চরিত্র হয়ে ওঠে তার নমুনা পড়ে নেওয়া যাক লেখকদের স্বীকারোক্তি থেকে।

> "তখন থাকি নর্থ ডেকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মান্টানায় গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সীটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে, হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া, কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো? গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম— Close your eyes and try to see. বাঃ, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রে ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই।"[১৪]

> "মুখে সান্টা ক্লোসের মতো সাদা গোঁফদাড়ি। টকটকে ফর্সা রঙ। পরণে প্যান্টশার্ট। পিঠে আঁটা একটা কিটব্যাগ। বাইনোকুলারে দূরের কিছু দেখছিলেন। মুখ তুলতে গিয়ে টুপি খসে পড়ল আর মাথায় চকচক করে উঠল চওড়া টাক। টুপিটা কুড়িয়ে টাক ঢেকে এগিয়ে গেলেন একটা ধ্বংস স্তূপের কাছে। সেখানে ফুলে ভরা ঝোপ। গুঁড়ি মেরে হাঁটু ভাঁজ করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক।
>
> তবে ভেবেছিলামসাহেব ট্যুরিস্ট। কারণ ঘটনাস্থলে লালবাগের (মুর্শিদাবাদ) প্রখ্যাত নবাবি প্রাসাদ হাজারদুয়ারি। ১৯৩৬ সালের শীতকাল। আনাচে-কানাচে 'গাইড'-রা ওত পেতে বসে থাকে। মওকা বুঝে একজন গাইড তাঁকে ভুলভাল ইংরেজিতে ধ্বংসস্তূপটার ইতিহাস শোনাতে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হেসে সাদামাটা বাংলায় বলে উঠলেন, এই প্রজাপতিগুলো বড্ড সেয়ানা।"[১৫]

হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি' রূপক চরিত্র। পাঠক মিসির আলিকে হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে দেখতে পান। তাঁদের বক্তব্য লেখক নিজেই আসলে মিসির আলি। পাঠকদের এই ভাবনাকে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

> "অনেকে মনে করেন লেখক নিজেই হয়ত মিসির আলি। তাঁদেরকেও বিনীতভাবে জানাচ্ছি — আমি মিসির আলি নই।"[১৬]

লেখক মিসির আলি না হলেও মিসির আলি আসলে লেখকের আইডিয়া তাঁর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাঙালি সাহেবটির আদলে কর্নেলকে গড়ে তুলেন। শুধু একটা ঘটনা, বাস্তবিক একটা লোক যিনি লেখকের মনে দাগ কাটেন। তারই ফলশ্রুতি কর্নেল সিরিজ।

এ রকম অনেক বিখ্যাত-অবিখ্যাত, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, প্রধান-অপ্রধান চরিত্র কোনও না কোনো আইডিয়া, ঘটনা বা ব্যক্তির আদলে গড়া। আলোচ্য গোয়েন্দা ভাদুড়িমশাই আইডিয়া নয়। তিনি সরাসরি লেখকের বন্ধু। লেখক সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন, তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এরমধ্যে একটা রহস্য তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। এই বন্ধুটি কে? সে বিষয়ে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাননি এবং পরিচয় করিয়ে দিতে অপরাগ। তা বোঝা যায় তাঁর নিজের নাতনিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

> "ভাদুড়ি মশাইয়ের গোয়েন্দাগিরির গল্পগুলো পুরোপুরি কাল্পনিক না হলেও তাঁর চরিত্রটি কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। না, বিশেষ কোনও গোয়েন্দার ধাঁচে তৈরি নন। বরং আমারই এক পরিচিত বন্ধুর আদলে তাঁর চরিত্রটি গড়া। বন্ধুটি বিখ্যাত কেউ নন। আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী। তাই নাম করে আর বিব্রত করলাম না।"[১৭]

প্রায় একইরকম কথা বলেছেন দে'জ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ভাদুড়ি-সমগ্রর প্রথম খন্ডের ভূমিকায়।

আমাদের কাজ হবে বাস্তবের ভাদুড়িমশাইয়ের রহস্য অনুসন্ধান করা। সাহিত্যের ভাদুড়িমশাইয়ের বয়স চরিত্র বৈশিষ্ট্য আমরা মোটামুটি অনুসন্ধান করে ফেলেছি। তাঁর সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা পেয়েছি আমরা। কিন্তু ভাদুড়িমশাই গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা ও লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থে যে ক্লু আমরা পাই তাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো কিছুটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যাবে। আমরা দেখে নেব সেইসব ক্লু গুলোকে এক এক করে।

কাহিনিতে ভাদুড়িমশায়ের সাথে কথক কিরণ চ্যাটার্জির প্রথম সাক্ষাৎ হয় মধ্যপ্রদেশের বিষাণগড়ে ১৯৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ড. সিদ্দিকির প্যালেসে। প্রথম দর্শনেই তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ চাওনি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন লোকটি সাধারণ পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা। যাকে বলে অসাধারণ। ১৯৭৩ সালের ঘটনা নিয়ে রচিত 'মুকুন্দপুরের মনসা' উপন্যাসে ভাদুড়িমশাইয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন,

> "ভদ্রলোকের চেহারা দেখলুম সেই আগের মতোই রয়েছে। বয়স হয়েছে। অথচ শরীরে কোথাও বাড়তি একটু মেদ নেই। তেমনই সটান, ঋজু দেহ। তেমনই জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, আর তেমনি তীক্ষ্ণ চাউনি।"[১৮]

এর সাথে কিছুটা মিলে যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'নীরবিন্দু'র এক বর্ণনার সাথে। সেখানে তিনি জানিয়েছেন,

> "প্রথম দর্শনেই নরহরিদাকে খুব ভালো লেগেছিল। ব্যায়াম-করা, পেটা স্বাস্থ্যের, মজবুত বাঁধুনির চেহারা। চোখ দুটির মধ্যে কিন্তু কোনও কাঠিন্য দেখলুম না। এক ঢাল কোঁকড়া চুলের ঘেরের মধ্যে বরং শ্যামলা রঙের মুখখানিকে ঈষৎ কোমলই দেখাচ্ছিল।"[১৯]

'নীরবিন্দু'র বর্ণনা দেখে কিছুটা মিল পাওয়া যায় ভাদুড়িমশাইয়ের সাথে। ভাদুড়ি-সমগ্র প্রথম খন্ডে স্বীকারোক্তিতে দেখি বাস্তবের ভাদুড়িমশাই লেখকের কলেজের বন্ধু। তবে 'নীরবিন্দু'র নরহরিদা (আসল নাম সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত) লেখকের স্কুল জীবনের বন্ধু। এছাড়া আমরা দেখতে পাই ভাদুড়িমশাইয়ের চোখদুটি তীক্ষ্ণ ও জ্বলজ্বলে। অথচ নরহরিদার চোখ দুটো কোমল। অতএব আমাদের অনুমান সঠিক নয়। অর্থাৎ নরহরিদা আর ভাদুড়িমশাই আলাদা ব্যক্তি।

দ্বিতীয় যে মানুষটিকে ভাদুড়িমশাই বলে মনে হতে পারে তাঁর দিকে এবার নজর দেওয়া যাক।"কলেজে পড়ার সময় তাঁর দৌহিত্র ললিত মুখুজ্যেকে আমার বন্ধু হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল।"[২০] সাহিত্যিক উপেন গাঙ্গুলি মশাইয়ের দৌহিত্র ললিতদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে রোববারের আড্ডা বসত। সেই আড্ডাই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যোগ দিতেন। ললিত মুখুজ্যে লেখকের কলেজের বন্ধু, তবে অগ্রজপ্রতিম কি না জানা যায় না। তবে ভাদুড়িমশাই সিরিজের বিখ্যাত রবিবসরীয় আড্ডা ভাদুড়িমশাইয়ের বোনের বাড়িতে বসত। সাহিত্যে তো সবসময় লেখকের বাস্তব জীবনের হুবহু নকল থাকে না। ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবলী হোক অনেকসময় কিছুটা বদলে সাহিত্যে পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রেও হয়ত অন্যথা হয়নি। বাস্তবে ললিত মুখুজ্যের বাড়ি সাহিত্যে ভাদুড়িমশাইয়ের বোনের বাড়ি হয়ে গেছে সম্ভবত।

তৃতীয় যে ব্যক্তিটিকে সন্দেহ হয় তাঁর নাম লেখক তাঁর 'নীরবিন্দু'তে উল্লেখ করে যাননি। উল্লেখিত গ্রন্থের ৩০১-৩০২ পাতায় ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি অগ্রজপ্রতিম শুভার্থী বন্ধুর সাথে যমুনার উৎসস্থল দেখতে গিয়ে ফেরার পথে জটাধারী এক সাধুর দর্শন পান। তারপর যে ঘটনাটি আছে তা আমাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাদুড়িমশাইয়ের কাহিনিতে বেশ কয়েকবার সাধুবাবার উল্লেখ দেখি। তবে 'মুকুন্দপুরের মনসা'তে যে সাধুর উল্লেখ পাই তিনি যে লেখকের নিজের পূর্বপুরুষ, তা জানতে পারা যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'পিতৃপুরুষ' থেকে।

'বিষাণগড়ের সোনা' উপন্যাসে ভাদুড়িমশাই জানান কিরণবাবু তাঁর থেকে চার বছরের ছোটো। সেই মোতাবেক আমরা যে ব্যক্তিটিকে ভাদুরিমশাই বলে অনুমান করতে পারি তিনি হলেন সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষকে। যিনি পরবর্তীতে লেখকের বেয়াই হন। লেখকপুত্র কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর 'বাবার কথা' নামক স্মৃতিকথামূলক লেখার ছোট্ট একটা তথ্য তুলে ধরা যাক। তিনি লিখছেন,

> "বাবার যখন সতেরো বছর বয়স ও সন্তোষকুমারের একুশ, তখন থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব।"[২১]

এক্ষেত্রে দুজনের বয়সের ব্যবধান চার বছরের। আবার 'নীরবিন্দু'তে দেখি কলেজে পড়ার সময় দুজনের আলাপ। অবশ্য 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সূত্রে। কিন্তু সন্তোষকুমারের পক্ষে যুক্তি নাকচ হয়ে যায় লেখকেরই নাতনি কমলিনী চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর বন্ধুটি বিখ্যাত কেউ নন। তাঁরই কলেজ জীবনের সহপাঠী। প্রথম কথা, সন্তোষকুমারের সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি কম ছিল না। অর্থাৎ বিখ্যাত লোক। দুই তিনি লেখকের কলেজজীবনের সময়ে আলাপ হলেও তিনি সহপাঠী ছিলেন না।

এরকম সম্ভাব্য ভাদুড়িমশাই আরও থাকতে পারেন। তবে লেখক যেহেতু নিজে বাস্তবের ভাদুড়িমশাইয়ের কথা প্রকাশ করতে চাননি, আমরাও তাঁর সেই অসম্মতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এখানেই থামব। নানা রহস্যের কিনারা করা ভাদুড়িমশাইয়ের বাস্তব জীবন রহস্যময় থাকা সমীচীন। তাতে পাঠকের উত্তেজনার রেসটুকু মিলিয়ে যাবে না।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মে ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৩০
২. তদেব, পৃ. ২৭১
৩. তদেব, পৃ. ৩১৭
৪. তদেব, পৃ. ১৪-১৫
৫. চক্রবর্তী, কমলিনী, সাহিত্যের গোয়েন্দারা, সুখী গৃহকোণ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬১
৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯, মে ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৩৯
৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, আগস্ট ২০১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২০৬
৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মে ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩০
৯. তদেব, পৃ. ৩২৭
১০. কবিতাই আমার মাতৃভাষা: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার কল্যাণ মণ্ডল, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা ২০১৮
১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, আগস্ট ২০১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪৬৫
১২. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, এপ্রিল ২০১৫, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪০
১৪. ভূমিকা, মিসির আলি অমনিবাস-১, হুমায়ূন আহমেদ, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পঞ্চম মুদ্রন- জুলাই ২০০০, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
১৫. কর্ণেল সমগ্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রথম খন্ড, দে'জ, ১৯৯৪
১৬. ভূমিকা, মিসির আলি অমনিবাস-১, হুমায়ূন আহমেদ, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পঞ্চম মুদ্রন- জুলাই ২০০০, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
১৭. চক্রবর্তী, কমলিনী, সাহিত্যের গোয়েন্দারা, সুখী গৃহকোণ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬০
১৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ভাদুড়ি-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মে ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৪
১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নীরবিন্দু, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৯৮
২০. তদেব, পৃ. ২৪৭
২১. ভৌমিক, তাপস (স.) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ২১২